খাপখাওয়ানো জীবন

পরিবর্তিত জলবায়ুতে উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের
অভিযোজন বিষয়ক গল্প সংকলন

PRAN

খাপখাওয়ানো জীবন

নুরুল আলম মাসুদ

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

প্রকাশক
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

প্রকাশকাল
জুন, দুই হাজার তের

সহযোগিতায়
গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান (সিএসআরএল)
উত্তরণ, *সিএসআরএল'র উপকূলীয় প্রচারাভিযান লিড সংগঠন*

যোগাযোগ
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান
বাড়ি ১১, সড়ক ৩৩/এ, হাউজিং এস্টেট
মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।
ফোন : +৮৮০ ৩২১ ৬১৯২০, ইমেইল : info@pran.org.bd
ওয়েবসাইট : www.pran.org.bd

এ প্রকাশনাটি সৃজনী সাধারণ অবাণিজ্যিক লাইসেন্সের আওতায় নিবন্ধিত। যে কোন অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকার পুরোপুরি, আংশিক বা যে কোন অংশ প্রকাশকের অনুমতি ছাড়াই ইন্টারনেট, সিডি, মুদ্রিত মাধ্যমে হুবহু বা সম্পাদনা করে সংরক্ষণ, পুনপ্রকাশ ও প্রচার করা যাবে। সূত্র উল্লেখের জন্য অনুরোধ রইলো।

জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন চর্চা

বিশ্ব উষ্ণতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তনের প্রভাবে বিপন্ন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমাদের ৭১০ কিলোমিটার বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চল সর্বাধিক বিপন্ন। ধারণা করা হয়, ২০৩০ থেকে ৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে যথাক্রমে ১৪ ও ৩২ সেন্টিমিটার। ফলে লবণাক্ত এলাকার পরিমাণ বাড়বে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে খাবার পানির সংকট দেখা দেবে। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বাড়ার কারণে শুকনো মৌসুমের কৃষি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নদীসমূহ ছাড়া দেশের সব উপকূলীয় নদীই লোনা পানি দ্বারা আক্রান্ত। শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততার মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে এবং লোনাপানির অনুপ্রবেশের কারণে উপকূলে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে। যে কারণে, ব্যাপক এলাকা শুষ্ক মৌসুমে ফসল উৎপাদনের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে। লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে নদীর পানিকে সেচের কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী করে তুলছে এবং লবণাক্ততার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানিও সেচ কাজে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে। নদী ভাঙ্গন উপকূলীয় এলাকার জন্য আরেক মহাবিপদ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জরিপে এ পর্যন্ত ১২০০ কিলোমিটার নদীতীর ভেঙে গেছে এবং আরও প্রায় ৫০০ কিলোমিটার ভাঙ্গনের সম্মুখীন। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে নদীভাঙ্গন বাড়ছে। মানুষ হারাচ্ছে তাদের জীবন এবং জীবিকা।

বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক জলবায়ুর ভিন্নতা এবং তার প্রভাবের কারণে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকরা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপখাইয়ে চলার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে আসছে। তাদের এই অভিজ্ঞতা বংশ পরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বিস্তৃত এবং চর্চা হয়ে আসছে, ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ এবং যাচাই প্রক্রিয়ার কারণে সেই সকল জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। এগুলো মূলত: কমিউনিটির নিজস্ব জ্ঞান, যা লোকায়ত জ্ঞান নামেও পরিচিত।

আজকের জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার প্রভাব ও পরিবর্তিত জলবায়ু আলোচনায় দেখা যাচ্ছে কমিউনিটির মানুষের সেই লোকায়ত জ্ঞানই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

টিকে থাকার জন্য নানা ধরণের পথ বাতলে দিচ্ছে।

উপকূলীয় এলাকা ঘুরে দেখা যায় এখানকার কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষ, গৃহনির্মাণে এই লোকায়ত জ্ঞান অন্যতম নিয়ামক হিসেবে মিশে আছে। বর্তমানে জলবায়ু অভিযোজন কৌশল হিসেবে বর্তমানে জলবদ্ধ এলাকায় ভাসমান চাষাবাদের কথা বলা হচ্ছে এবং অনেক এলাকায় তার প্রয়োগও শুরু হয়েছে। কিন্তু উপকূলীয় পিরোজপুর জেলার কৃষকরা প্রায় শত বছর আগ থেকে ধাপ (জলাবদ্ধ এলাকায়/ বর্ষায় ভাসমান চাষ) পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে আসছে।

আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠি এখনও অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্র-প্রযুক্তিনির্ভর এবং অনেকটাই প্রকৃতিনির্ভর নানা ধরণের পেশার সাথে যুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে কৃষি, মৎস্যচাষ, গবাদিপশু পালন ইত্যাদি। যুগ যুগ ধরেই গ্রামীণ কৃষক পরিবর্তিত আবহাওয়ায় চাষাবাদ থেকে শুরু করে জীবনযাপন- এমনকি গৃহ নির্মাণেও পরিবর্তন এনেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ভূ-প্রাকৃতিক এবং আবহাওয়াগত পরিবর্তন হচ্ছে। কোন কোন এলাকায় লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, বছরব্যাপী জলাবদ্ধতা, নদী ভাঙ্গনের ঘটনা ঘটছে। তাই আমরা এ জাতীয় পরিস্থিতিতে উপকূলীয় অন্যএলাকার মানুষ কীভাবে খাপখাওয়াতে পারে বা কি ধরণের কৌশল গ্রহণ করতে তা আরেকএলাকার মানুষকে জানানোর জন্য উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যকার লোকায়ত জ্ঞানসমূহ তথ্যায়নের চেষ্টা করেছি।

আমাদের বিশ্বাস এই প্রকাশনা থেকে পরিবর্তিত আবহাওয়ার কিভাবে টিকে থাকতে পারে এবং কৌশলগুলো কী কী সে বিষয়ে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে, যা নিজেদের অঞ্চলে চর্চার মাধ্যমে কিছুটা বিপদ লাঘবে সক্ষম হবে। *গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান (সিএসআরএল)*, সিএসআরএলের উপকূলীয় অঞ্চলের লিড সংগঠন *উত্তরণ*'র সহযোগিতায় এ পুস্তিকাটি এবং এর সমুদয় কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। সিএসআরএলের উপকূলীয় অঞ্চলের ফোকাল সাংবাদিক গৌরাঙ্গ নন্দী' এ প্রকাশনাটির জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করছেন। উপকূলীয় বিভিন্ন জেলার গণমাধ্যম ও উন্নয়ন-কর্মীরা পুস্তিকার জন্য অভিযোজন সংক্রান্ত গল্পগুলো সংগ্রহ করছেন এবং লিখেছেন। আমরা সকলের সহায়তা ও প্রণোদনার জন্য কৃতজ্ঞ।

নুরুল আলম মাসুদ
প্রধান নির্বাহী
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

ভাসমান সবজি বীজতলা

পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার চাষের জমিগুলো বছরের বেশির ভাগ সময়ই জলাবদ্ধ থাকে। একটা সময় এসব জমিতে কোনো শস্য উৎপাদন সম্ভব হতো না বলে বোরো মৌসুমের পর পুরো জমিই পতিত পড়ে থাকতো। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য স্থানীয় কৃষকেরা ভাসমান সবজি বীজতলা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই এলাকায় এক থেকে দেড়'শ বছর ধরে এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয়ে আসছে; এবং স্থানীয় চাষিরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

নাজিরপুর উপজেলার মুগারঝোর গ্রামের কৃষক আবদুর রশিদ মোল্লা। বোরো মৌসুমের পর তিনি নিজের পতিত জমিতে এ পদ্ধতিতে চাষ করে বাড়তি আয় করতে পারছেন। আগে বোরো ধান ওঠে গেলে জলাবদ্ধ জমি পতিত থাকতো। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর যখন জমিতে পানি আসে তখন তিনি কচুরিপানা, শ্যাওলা, টোপাপানা, ক্ষুদেপানা দিয়ে ধাপ তৈরি করেন। প্রথমে কচুরিপানা দিয়ে পরে পর্যায়ক্রমে শ্যাওলা, কুটিপানা ও দুলালীলতা স্তরে স্তরে সাজিয়ে দুই ফুট পুরু ধাপ তৈরি করা হয়। সাধারণত ধাপগুলো তিন-চার হাত লম্বা ও এক'শ বিশ থেকে এক'শ ত্রিশ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। ভাসমান ধাপের ওপরে না উঠে পাশ থেকে ফসল লাগানো, পরিচর্যা ও সংগ্রহ করা যায় সেজন্য ধাপগুলো তিন-চার হাতের বেশি চাওড়া হয় না। বীজ গজানো, দৌল্লা তৈরি ও বীজ-চারা বাজারজাতকরণে স্থানীয় নারীরাও অংশগ্রহণ করেন। একজন নারী একহাজার দৌল্লা ও বীজ-চারা তৈরির জন্য দুইশ টাকা মজুরি পান। এ কাজ করে এক মৌসুমে একজন নারী পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করে থাকেন।

ভাসমান ধাপে সরাসরি বীজ বপন সম্ভব নয়। এর জন্য টোপাপানা দুলালীলতা ও নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তারা এক ধরনের আধার তৈরি করা

হয়, যা স্থানীয়ভাবে দৌল্লা' নামে পরিচিত। দৌল্লার মধ্যে বিভিন্ন সবজির বীজ পুঁতে শুকনো স্থানে রাখা হয়। পরে অঙ্কুরিত বীজ ভাসমান সবজি তলায় বসানো হয়। এ পদ্ধতিতে লাউ, করলা, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, শিম, কুমড়া, বেগুন, টমেটো প্রভৃতি সবজির চারা উৎপাদন করা হয়। চারার বয়স একমাস হলে দৌল্লাসহ চারা উত্তোলন করে তা বাজারজাত করা হয়। বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে এই চারা বিক্রি হয়। ভাসমান পদ্ধতিতে বাধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি ফলানোর জন্য কচুরিপানার উপরে টোপাপানা দিয়ে নারকেলের ছোবড়া বিছিয়ে এসব সবজির বীজ বোনা হয়। এখানে চারা হয়ে গেলে তা কান্দি বেড়ে লাগানো হয়। শশা, ঢেঁড়স এমনকি হলুদও এই পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।

এই ভাসমান ধাপগুলো দুই থেকে তিন এমনকি দুই-তিন বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। পরবর্তি মৌসুমে ধাপে প্রয়োজন অনুপাতে শুধুমাত্র কচুরিপানা ও শ্যাওলা যোগ করতে হয়। এ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল স্থানীয়ভাবেই সংগ্রহ করা হয়। কচুরিপানা, শ্যওলা, টোপাপানা, ক্ষুদেপানা স্থানীয় জলাভূমিতে পর্যাপ্ত পরিমানে উৎপাদিত হয়। সাধারণত দুই-তিন জন শ্রমিক দুই থেকে তিন দিনে এক'শ হাত লম্বা ও দুই-তিন হাত চওড়া একটি ধাপ তৈরি করতে পারে। জ্যৈষ্ঠমাস থেকে শুরু হয়ে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলে। জমি থেকে পানি নেমে গেলে সেই জমিতে আবার বোরো চাষ চলে। তখন ধাপগুলো কম্পোস্ট সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। একেকটি ধাপ তিন থেকে পাঁচ'শ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা যায়।

এ পদ্ধতির চাষ করে স্থানীয় কৃষক আবদুর রশিদ এক মৌসুমে দশ থেকে বার হাজার টাকা লাভ করে থাকেন। পতিত জমিতে এ পদ্ধতিতে চাষ করে এলাকার অনেক পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছেন। নাজিরপুরে বর্তমানে প্রায় পাঁচ হাজার একর জমিতে ভাসমান পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চারা ও সবজি উৎপাদন করা হয়। এ পদ্ধতিতে চাষের জন্য তারা বীজ স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করেন। জলাবদ্ধ চাষাবাদের ক্ষেত্রে এলাকায় এ পদ্ধতি বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সেরজান কৃষি

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার পিলজং ইউনিয়নের গুড়গুড়িয়া গ্রামের মাসুম মোল্লা। ছয় সদস্যের সংসার। এক সময় নিজের জমিতে পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একানব্বইয়ের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এই উপজেলার বেশিরভাগ অংশ পানির নিচে তলিয়ে যায়। পরবর্তীতে জোয়ারের সময় নিয়মিত প্লাবিত হতে থাকে গ্রামটি। প্রতি বছর বর্ষার মৌসুমে পুরো গ্রাম দীর্ঘ সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকে। ১৯৯৩ সালের দিকে পার্শ্ববর্তী নদীর মুখে স্লুইস বসানো হয়, যাতে জোয়ারের পানি উপরের দিকে আসতে না পারে। কিন্তু বছর দুয়েকের পর বর্ষায় অতি বৃষ্টিতে বৃষ্টির পানি সরে যেতে না পারায় পুরো এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। ফলে পুরো গ্রামের কৃষিজমি পানির নিচে তলিয়ে যায়।

এলাকাটি পান চাষের জন্য বিখ্যাত। পানের বরজে সামান্য পানি জমলে পানের উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। গ্রামে পরপর কয়েক বছর জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় পুরো গ্রামে পানের ফলন খারাপের দিকে যায়। এসময় পানচাষী মাসুম মোল্লার মাথায় আসে নতুন এক বুদ্ধি। তিনি আটানব্বই সালের বন্যার আগে তার ২০ বিঘা পানের বরজে পানি নিষ্কাশনের জন্য সারি সারি সিট্রম চ্যানেল খনন করেন। খননকৃত মাটি দিয়ে পানের সারিগুলো আরো উঁচু করে তৈরি করেন। সে বছর অন্যচাষীর পানের বরজ সম্পূর্ণ পানির নিচে তলিয়ে গেলেও মাসুম মোল্লার বরজে খুব একটা ক্ষতি হয়নি। স্থানীয় ভাবে এটিকে সেরজান পদ্ধতি বলা হয়। তিনি পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় বেশ ভালো ফলন লাভ করেন। পরবর্তী বছরে তিনি তাঁর পুরো জমিতে সোরজান প্রয়োগ করে ভাল ফলন পান। কিন্তু এই পদ্ধতি গ্রহণের আগে মাসুম মোল্লা পান চাষ করে খুব একটা লাভ করতে পারেননি। ফলে তিনি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ঋণ শোধ করার জন্যে তাকে দুই একর জমি বিক্রি করে দিতে হয়। তবে

বর্তমানে সোরজান পদ্ধতিতে পান চাষ করে তিনি প্রতিমাসে গড়ে বার থেকে পনের হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করেন।

এ পদ্ধতিতে পান চাষ করার জন্য কোনো নতুন কাঁচামালের প্রয়োজন হয় না। শুধু কিছু বাড়তি শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে মাটি খনন করে সোরজান তৈরি করতে হয়। তাছাড়া সকল উপকরণ যেমন সবজির বীজ, বাঁশের খুঁটি প্রভৃতি নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমানে অনেকেই নিজেরাই নিজেদের জমিতে এ পদ্ধতিতে পান চাষ করছেন। কেউ অন্যের জমি লিজ নিয়ে চাষ করছেন। ফলে এলাকার বেশিরভাগ জমিতে চাষ হচ্ছে এবং মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম বছর কেউ উদ্যোগটিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু প্রথম বছরেই এই পদ্ধতিতে পান চাষের ফলে তার আয় ফলন দেখে এলাকার অনেকেই উদ্যোগটিকে গ্রহণ করেন। বর্তমানে পুরো পিলজং ইউনিয়নসহ পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নগুলোতে এ পদ্ধতিতে পানসহ অন্যান্য ফসলাদি আবাদ করা হচ্ছে। প্রথম দিকে তিনি নিজে সেরজান পদ্ধতিতে চাষ করার পাশাপাশি অন্যদেরকেও এ পদ্ধতি সম্পর্কে উৎসাহিত করেছিলেন।

পিলজং ইউনিয়নসহ আশপাশের ইউনিয়নগুলোর প্রত্যেকটি পরিবারই বর্তমানে এ পদ্ধতিতে পান চাষের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে এ এলাকার প্লাবনের কারণে ফসলহানির হয়ে আর্থিক ক্ষতির শিকার হওয়ার সম্ভবনা নেই বললেই চলে। প্রায় সকল কৃষকই আগের চেয়ে অনেক স্বচ্ছল জীবনযাপন করছেন।

এ উদ্যোগটি বন্যা ও জলাবদ্ধতার সাথে অভিযোজনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। জলাবদ্ধতা ও আকস্মিক বন্যার কারণে এ এলাকায় পান চাষ সম্পূর্ণ ব্যাহত হচ্ছিল, কিন্তু বর্তমানে এ পদ্ধতিতে পান চাষের ফলে কোনো জমি অনাবাদী থাকছেনা। বছরের প্রায় বার মাস এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এখানে পান চাষ হচ্ছে।

ঝুলন্ত সবজি চাষ

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর জেলার মনিরামপুরের শোভা রাণী সরকার। দু'ছেলে আর স্বামী নিয়ে তার সংসার। এই পরিবারটি একটা সময় এলাকার সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ছিলেন। পারিবারিকভাবেই তারা কৃষিজীবী। প্রায় সারা বছরই তাদের জমিতে বিভিন্ন ধান আর রবিশস্য চাষাবাদ হতো। উৎপাদিত ফসল থেকে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়েও বাকিটা বিক্রি করে সংসারের অন্যসব চাহিদা পূরণ হতো।

ষাটের দশকে এ অঞ্চলে সবুজ বিপ্লবের নামে শুরু হয় উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, পার প্রতিক্রিয়া এখানকার জলাভূমি শুকিয়ে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত; নদী ব্যবস্থাপনা ও জোয়ার ভাটার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। নদীর নাব্যতা রক্ষা ও পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-র সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করে খুলনা-যশোর নিস্কাশন প্রকল্প (কেজেডিআরপি)। এ প্রকল্পের ফলে প্রথম ছয় থেকে আট বছর এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদিত হয়। কিন্তু আশির দশক থেকে দেখা দেয় ব্যাপক জলাবদ্ধতা। খুলনা ও যশোর জেলার বিভিন্ন এলাকায় এ জলাবদ্ধতা ব্যাপক আকার ধারণ করে।

জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে এখানকার ফসলী কৃষি উর্বরভূমি। বন্ধ হয়ে যায় এলাকায় আমন ধানসহ রবি শস্যের চাষাবাদ; কমতে থাকে বোরো ধানের চাষও। কৃষকরা হয়ে পড়েন কর্মহীন। এরফলে এলাকার অন্যদের মতো মারাত্মক আর্থিক দৈন্যতা নেমে আসে শোভা রাণীদের সংসারে। একটা সময় তারা কৃষিপেশা ছেড়ে দিতে করতে বাধ্য হন। পরে শুরু করলেন মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ। তাতেও আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরানো সম্ভব হয়নি। বর্ষায় চার-পাঁচ মাস তাদের বাড়ির উঠান পানির নিচে তলিয়ে থাকে। এ সময়ে আঙ্গিনায়

সবজি চাষও সম্ভব হয় না। ফলে পরিবারের ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদা পূরণ করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তিনি জীবিকার নির্বাহের জন্য বিভিন্ন উপায় খুঁজতে থাকেন। এরমধ্যে তার মাথায় আসে ঝুলন্ত সবজি বাগান করার চিন্তা। পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে শোভা রাণী সরকার ঝুলন্ত সবজি চাষ পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেন। বাড়ি ও চারপাশের ময়লা আবর্জনা একটি গর্তে জমা করে সেগুলো পনের দিন রেখে তার সঙ্গে মাটির মিশ্রণ করেন। তারপর বড় মাপের চাড়িতে (নাদা) জৈব সার যুক্ত মাটি ভরে পাঁচ থেকে ছয় ফুট উচু তিনটি বাঁশের খুটি পুঁতে তার সাথে বাঁশের ছোট তিনটি টুকরা দিয়ে তিন কোনা করে বাধতে হয়। তার ওপর মাটির চাড়িটি বসানো হয়।

এ ধরনের পদ্ধতিতে সাধারণত কম শিকড় যুক্ত গাছ রোপন করতে হয়। পুঁইশাক, শসা, উচ্ছে, মরিচ, টমেটো, চাল কুমড়া, ঝিঙ্গে প্রভৃতি। শোভা রাণীর সঙ্গে প্রথমে ত্রিশ জন নারী এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেন। পরবর্তীতে দেড়'শ জন নারী এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেন। এ পদ্ধতির সাফল্য দেখে বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এই পদ্ধতিতে তাদের কর্মএলাকায় সবজি চাষ শুরু করেন। এ পদ্ধতিতে স্থানীয় জাতের সবজি চাষ করছেন এবং বীজ সংগ্রহ করে পরের বছর চাষ করতে পারেন।

ঝুলন্ত সবজি চাষ জলাবদ্ধ এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানে উৎপাদিত সবজির মাধ্যমে নিজেদের পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে, বাড়তি ফসল বিক্রি করে অতিরিক্ত কিছু আয়ও করতে পারছেন। এ পদ্ধতির চাষের ফলে নারীরা তাদের পরিবারে উপার্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারছেন।

এই পদ্ধতিতে সারা বছর একই বাড়িতে সবজি চাষ করা সম্ভব। যা দিয়ে খুবই কম খরচে অধিক সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। ঝুলন্ত চাষ পদ্ধতিতে লবণাক্ত এলাকায়ও সবজি চাষ করা যায়। বর্তমানে চিংড়ি চাষের কারণে লবণাক্ত জমিতেও এ পদ্ধতিতে সবজি চাষ করে স্থানীয় কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন।

তিশি চাষ

দ্বীপ হাতিয়ার নঙ্গোলিয়ার চরে বসবাস করেন রহিমা বেগম। বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে দুই মেয়ে নিয়ে কোনোমতে টেনে চলছেন সংসারের ঘানি। দুই হাজার নয় সালে সরকারের কাছ থেকে দেড় একর জমি বরাদ্দ পান। জমির এক কোণায় ছোট্ট একটি ঘর তোলেন করেন আর বাকি অংশ অনাবাদী পড়ে থাকে। জমিতে কাজল শাইল ধান ছাড়া তেমন কোনো ফসল উৎপাদন হতো না। লবণাক্ততার কারণে ধান, তরমুজ বা তেমন কোন ফসলই উৎপাদন হতো না। এই এলাকার জমিগুলোতে লবণাক্ততা এত বেশি যে জমিতে কোন ফসলই তেমন বেশি বাড়ে না, কিছুদিন পর মারা যায়।

রহিমা বেগম তার জমিতে দু'একবার কাজল শাইল ধান চাষ করেন। চাষাবাদের খরচ অনুযায়ী উৎপাদন তুলনামূলক কম। ধানচাষেও লাভ দেখলেন না। অনেক মানুষ চাষাবাদ ছেড়ে দিলেন আর এলাকার হাজার একর জমি অনাবাদি পড়ে থাকতো। এরমধ্যে সন্দ্বীপ থেকে আসা কিছু মানুষ তখন এখানে নিজেদের উদ্যোগে তিশি চাষ শুরু করলেন। সন্দ্বীপ অঞ্চলে অবশ্য আগ থেকেই তিশি চাষের প্রচলন ছিল।

সন্দ্বীপ থেকে আসা কৃষক সিরাজ উদ্দিনের কাছ থেকে রহিমা বেগম তিশি চাষের ধারনা পান, লবণাক্ত জমিতেও তিশি চাষ সম্ভব। তিশি চাষের জন্য জমিতে একহালই যথেষ্ঠ, আগাছা পরিস্কার, সার কিংবা বিশেষ কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না, আলাদা করে সেচ দিতে হয় না। এক একর জমিতে বীজ ফেলতে তার সর্বমোট খরচ হয় দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা। অগ্রাহায়ণ মাসে জমিতে বীজ ফেললে চৈত্রের মাঝামাঝি সময়ে ফলন উঠে আসে। প্রতি মন তিশি বিক্রি হয় দুই হাজার থেকে দুই হাজার দুইশ টাকায়। তিনি এখন তিশি চাষ করে স্বচ্ছলতা অর্জন করেছেন।

উৎপাদনের পর তা বিক্রি করছেন পাইকারদের কাছে। অনেক সময় পাইকাররাও বাড়িতে এসে তিশি কিনে নিচ্ছেন। তবে বাজারজাত করতে এখনো কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। স্থানীয় বাজারে তিশি বিক্রি হয় না। এর জন্য পনের-বিশ কিলোমিটার দূরে সুবর্ণচর উপজেলায় যেতে হয়।

রহিমা বেগমের এ উদ্যোগের অভাবনীয় সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানে নঙ্গলিয়ার চরের কয়েক শত পরিবার তিশি চাষ শুরু করছে। তিশি চাষ করে তারাও নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছে। তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই এলাকায় তিশি চাষ করে যাচ্ছেন। আর তিশির বীজ স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা যায়। বর্তমানে নঙ্গলিয়ার চরের প্রায় আশি শতাংশ জমিতে তিশি চাষ হচ্ছে।

তিশি চাষের পর জমি এখনো অনাবাদি থেকে যায়, তবু এ উদ্যোগের ফলে এলাকার প্রত্যেক পরিবারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়েছে। কেউ নিজেরাই নিজেদের জমিতে তিশি চাষ করছেন। আবার কেউ অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করছে। তিশি চাষ স্থানীয়ভাবে কৃষকদের অনেক সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। তারা এখন এক চাষে জমিতে কৃষক তিশি উৎপাদন করতে পারছেন। তিশি সংগ্রহের পর তিশি গাছ খড়ের মতো জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া লবণাক্ত জমিতে তিশি চাষ করে কৃষকরা নিয়মিতভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন বলে স্থানীয় কৃষকরা এই পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

নোনা জলে কাঁকড়া চাষ

আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকায় দীর্ঘদিন ধরে খুলনা-সাতক্ষীরা জেলায় চিংড়ি চাষ হয়ে আসছে। কিন্তু চিংড়ি চাষের জন্য লবণ পানি ব্যবহার করার ফলে এখানকার মাটি ও পানিতে ভয়াবহ মাত্রায় লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। লবণাক্ত মাটিতে ধান বা অন্যান্য ররি শষ্যের উৎপাদন হয় না। যার ফলে এখানে কৃষি উৎপাদনে ধ্বস নেমেছে।

লবণাক্ততার কারণে এসব জমিতে চিংড়ি চাষের পরিবর্তে অন্য কিছু চাষ সম্ভব নয়। লবণাক্ততা কমিয়ে জমিকে অন্য কোন ফসল চাষের উপযোগী করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। একবার যে জমি চিংড়ি চাষের আওতায় আসে, তা আর চিংড়ি চাষ মুক্ত হতে পারে না। বরং কোনো এলাকায় চিংড়ি চাষের ফলে পাশের জমিও লবণাক্ততার শিকার হয়, এবং ঐ জমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়। এতে পরের মৌসুমে পাশের জমিতেও চিংড়ি চাষ করা ছাড়া উপায় থাকে না। এভাবেই চিংড়ি চাষ এলাকার সম্প্রসারণও ঘটেছে।

চিংড়ি চাষের ফলে জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে কৃষিশষ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে এই এলাকায় নোনা পানিতে কাঁকড়ার চাষ বা ফ্যাটেনিং লাভজনক বিধায় স্থানীয় কৃষকেরা এ পদ্ধতির দিকে ঝুঁকছেন। কাঁকড়ার ফ্যাটেনিং-এর ক্ষেত্রে বাজারে বিক্রির উপযুক্ত আকারের অপরিপক্ক কাঁকড়াকে দুই থেকে চার সপ্তাহ ঘেরে রেখে দেয়া হয়। এ সময় ঘেরে থাকা কাঁকড়াগুলো পরিপক্ক হয় অর্থাৎ গোনাড পরিপুষ্টভাবে তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে এই পরিপক্ক স্ত্রী কাঁকড়ার চাহিদা ও মূল্য অনেক বেশি। ফলে স্থানীয়রা স্বল্প পুঁজিতে অধিক লাভ করতে পারে বলে এ অঞ্চলে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উপকূলীয় গলাচিপার সোনাচর,

রূপাচর, চরমোহানতদাজসহ একাধিক চরের চাষিরা এ পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষের সাথে যুক্ত। স্থানীয় কৃষকরা প্রতি কেজি ছোট (চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গ্রাম প্রতিটি) কাঁকড়া ষাট থেকে আশি টাকায় সংগ্রহ করেন। পনের থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে স্ত্রী-কাকড়াঁ বিক্রয় উপযোগী হয়ে যায়। খাবার হিসেবে কাকড়াঁকে শামুক, ঝিনুক ও নাড়িভূড়ি জাতীয় সহজলভ্য খাবার দিতে হয় বলে এর উৎপাদন খরচও কম। কাকড়াঁর খামারে ভাইরাস সংক্রমণেরও ভয় নেই।

পরিপুষ্ট কাঁকড়া নয়'শ থেকে এক হাজার টাকা দরে বিক্রি হয়। অল্প সময়ে কাঁকড়া বিক্রি থেকে কেজিতে পাঁচ'শ থেকে ছয়'শ টাকা পর্যন্ত লাভ হয়। খুলনা মৎস্য বিভাগের তথ্য মতে, বর্তমানে খুলনা জেলার প্রায় চার হাজার, সাতক্ষীরা জেলার তিন'শ সাতটি ও বাগেরহাট জেলার তিন'শ তেত্রিশটি ঘেরে এ পদ্ধতিতে কাঁকড়া উৎপাদন হচ্ছে। এর ফলে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

কাঁকড়ার জন্য দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটি সবচেয়ে ভালো। পুকুরের আয়তন ছোট হলে কাঁকড়া মজুদ করতে সুবিধা হয়। নোনা পানির উৎসস্থল যেমন নদী বা সমুদ্রের কাছে হলে খুবই ভালো হয়। প্রায় দেড় মিটার উচ্চতার বাঁশের বানা (পাটা) দিয়ে পুকুরের চারপাশ ঘিরে ফেলা হয়। বানা প্রায় আধা মিটার মাটির নিচে পুঁতে দিতে হয়, যাতে কাঁকড়া পুকুরের পাড় গর্ত করে পালিয়ে যেতে না পারে। মাটির পিএইচ-এর ওপর ভিত্তি করে পাথুরে চুন গুড়া করে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দেয়া হয়। তবে বিভিন্ন স্থান থেকে পোনা সংগ্রহ করে আনার সময় মাঝেমধ্যে কৃষকদের পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হয়।

এ পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষের ফলে স্থানীয় কৃষকরা যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, তেমনি কাঁকড়া রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করা সম্ভব। পোনা উৎপাদনে হ্যাচারি স্থাপন, স্থানীয় পর্যায়ে বাজার ব্যবস্থাপনা, ধব্যাংক ঋণ প্রদান ও পুলিশি হয়রানী বন্ধ করা প্রয়োজন। উপকূলীয় অঞ্চলে নোনা পানিতে চিংড়ি চাষের পাশাপাশি কাঁকড়া ফ্যাটারিং-এর ফলে লবনাক্তাতার অনাবাদী জমিও উৎপাদনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের সাথে স্থানীয় মানুষের টিকে থাকার ক্ষেত্রে কাঁকড়া ফ্যাটারিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জালি মাছ চাষ

চট্টগ্রামের বাঁশখালি উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়নের শামসাদ আলম। এক সময় ছিলেন পুরোদস্তর গৃহস্থ-কৃষক। চার একর জমিতে চাষাবাদ করে ভালোই কাটাচ্ছিলেন সংসার-জীবন। কিন্তু ঊনিশ'শ একানব্বই সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে জমিতে দরিয়ার লোনাপানি ঢুকে করে সমস্ত ফসল বিলীন করে দেয়। দীর্ঘদিন জলাবদ্ধতায় নিমজ্জিত থাকে পুরো ইউনিয়ন। জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে পরবর্তী দু'বছর এলাকার বেশিরভাগ জমিতে চাষাবাদ ব্যাহত হয়। জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার ফলে ধান উৎপাদনও সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়। ফলে কৃষিজীবী মানুষগুলো হয়ে পড়েন কর্মহীন। অভাবের তাড়নায় অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি, দিনমজুরি, রিকশা-ঠেলাগাড়ির শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিকের কাজ বেছে নেয়। শামসাদ আলমের পক্ষে এসবের কোণটাই গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। শুরু করেন বাড়ির পুকুরে মাছ চাষ; এ দিয়ে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ।

১৯৯৩ সালের বর্ষাকালে ইউনিয়নের বেড়িবাঁধটি ভেঙ্গে যায়। জোয়ারের পানিতে শামসাদ আলমের পুকুরের সব মাছ ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। উপায়ান্তর না দেখে জাল দিয়ে পুকুরের চারদিকে বেড়ার মতো করে একটি বাঁধ তৈরি করেন। জাল দেওয়ার কারণে তার পুকুরের মাছ ভেসে যায়নি। দু'দিন পর তিনি দেখলেন তাঁর বাড়ির পার্শ্ববর্তী নিচু জমিতে জোয়ারের সাথে আসা মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। তিনি বাড়ি থেকে জাল এনে পুরো পুকুর আর পাশের নিচু জমির চারদিকে জালের বেড়া তৈরি করেন। পানি নেমে যাওয়ার পর দেখলেন সাগর থেকে উঠে আসা মাছের খৈ ফুটছে তাঁর জমিতে। জালের বেড়ায় জমিতে মাছের এ প্রাচুর্যে তিনি সেই থেকে প্রতি বছর বর্ষার শুরুতে এপ্রিল মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত জালের বেড়া দিয়ে মাছ চাষ করেন। এলাকায় এ পদ্ধতির মাছ চাষকে 'জালি মাছ চাষ' বলা হয়।

এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরুর পর থেকে শামসাদ আলম আর্থিকভাবে লাভবান হতে থাকেন। বাড়িতে তিনি সেমি-পাকা ঘর তুলেছেন, এখন তিনি গ্রামে স্বচ্ছল একটি পরিবারের প্রতিনিধি। একটা সময় শাসনাদ আলম কৃষি থেকে মাসিক গড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করলেও একানব্বইয়ের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর মাসিক পাঁচ-সাত'শ টাকা আয় করাও তার জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। বর্তমানে জালি মাছ চাষের ফলে তার মাসিক আয় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাত হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকায়। পাশাপাশি মাছ চাষের আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনি বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করছেন, শাক-সবজির চাষ করছেন, শীত মৌসুমে জমিতে ধান আবাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার ক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছেন।

শামসাদ আলমের উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে পতিত জমিতে এলাকার সকল কৃষক জালি পদ্ধতিতে মাছ চাষে উদ্যোগী হয়েছেন। বর্তমানে বেশির ভাগ কৃষকই বর্ষাকালে এ পদ্ধতি অনুসরণ করছেন। বর্তমানে গন্ডামারা ইউনিয়নের নব্বই শতাংশ জমি, খাল এমনকি বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকায় জালি পদ্ধতিতে মাছ চাষ হচ্ছে। ইউনিয়নের প্রত্যেকটি পরিবার কেউবা জমি লিজ নিয়ে জালি পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছেন।

এ পদ্ধতিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে কাদা মাটি, বাঁশ আর জাল ব্যবহৃত হয়। এলাকার প্রত্যেক কৃষকের বাড়িতে পর্যাপ্ত বাঁশ ঝাড় রয়েছে। জাল তৈরি করা কিংবা সংগ্রহ করা বর্তমানে খুব কষ্ট সাধ্য নয়। ফলে এ পদ্ধতির চাষের জন্য এলাকায় কাঁচামালের কোনো সংকট নেই। উদ্যোগটি জলাবদ্ধতার সাথে অভিযোজনে কার্যকরি ভূমিকা পালন করছে। জলাবদ্ধতা ও আকস্মিক বন্যার কারণে এ এলাকায় ধান চাষ সম্পূর্ণ ব্যাহত হচ্ছিল। বর্তমানে জালি পদ্ধতিতে মাছ চাষের ফলে কোনো জমি অনাবাদী থাকছে না। ফলে এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি জমিতে এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ হচ্ছে। বছরের প্রায় নয় মাস এ পদ্ধতিতে এখানে মাছ চাষ হয়। আর বছরের বাকি সময়ে কৃষকরা একই জমিতে বোরো চাষ করছেন।

গাওতা

বর্ষায় গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও পিরোজপুরের বিস্তীর্ণ জমি পানিতে ডুবে থাকে। এক সময় এসব অঞ্চলে আমন মৌসুমের পর জলাবদ্ধতার কারণে চাষাবাদ সম্ভব হতো না। পতিত হয়ে থাকতো অনেক জমি। কৃষকরা কর্মহীন হয়ে পড়তেন পুরো বর্ষা জুড়ে। এ অবস্থায় স্থানীয় কৃষকরা জলমগ্ন জমিতে চাষাবাদের জন্য নতুন এক চাষ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। স্থানীয়ভাবে এ পদ্ধতি 'গাওতা' নামে পরিচিত। এ চাষের ফলে পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আসে; বর্ষা মৌসুমেও কৃষকদের জীবিকার সংস্থান হয়েছে।

শতাধিক বছর ধরে গাওতা পদ্ধতির চাষাবাদ করে আসছে এ অঞ্চলের মানুষ। গোপালগঞ্জ জেলার চান্দার বিল ও আশপাশের এলাকা বছরে ছয় থেকে সাত মাস পানির নিচে থাকে। আমন ধান কাটার পর গাছের মুড়া পানির নিচে থেকে যায় এবং পঁচতে থাকে। শীতকালে পানি নেমে গেলে ধানগাছের মুড়া সংগ্রহ করে মাটিতে স্তুপ করে রাখা হয়। বর্ষাকালে যখন সমস্ত এলাকা প্লাবিত হয় তখন ধান গাছের মুড়াগুলো ভেসে ওঠে। স্থানীয়রা একে 'জেটো' বলেন। ভাসমান ধান গাছের মুড়ার ওপর দুই স্তরে কচুরিপানা রাখা হয়। ধাপের উপরের দিক সাধারণত সমতল থাকে। উপরের স্তরে সামান্য পরিমাণ জোব বা ফাঁসমাটি দেওয়া হয়। এ ভাসমান ধাপগুলো দশ থেকে বার মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ধাপগুলোর দৈর্ঘ জমির দৈর্ঘের মাপে করা হয়। তবে চওড়া কম করা হয়। যাতে করে ধাপের উপর না উঠে পাশ থেকে ফসল বোনা, পরিচর্যা ও তোলা যায়।

মে-জুলাই মাসের দিকে পুকুর, খাল, নদীসহ বিভিন্ন জলাভূমি থেকে কচুরিপানা সংগ্রহ করা হয়। গোপলগঞ্জে দীঘা ধানের খড়ের উপরও গাওতা তৈরি করা হয়। বর্ষাকালে পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে প্রাথমিকভাবে

ধাপগুলোতে ঢেঁড়স, শসা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি চাষ করা হয়। বর্ষার শেষে লাল শাক, ওলকপি, পানি কচু, মরিচ ইত্যাদি চাষ করা হয়। শীতকালে পানি কমে গেলে ধাপগুলোকে উচু জমিতে এনে মাটি মিশিয়ে কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এসময় কৃষকরা জমিতে পুঁইশাক, লাউ, বরবটি, মুলা, সীম, পিয়াজ প্রভৃতি উৎপাদন করেন।

এ পদ্ধতির চাষের প্রধান উপকরণ হচ্ছে কচুরিপানা, যা এলাকায় খুবই সহজলভ্য। ফলে এ পদ্ধতির জন্য কৃষকদের বাড়তি বিনিয়োগ করতে হয় না। আমন মৌসুমের পর জলাবদ্ধ পতিত জমিতে গাওতা পদ্ধতিতে চাষের ফলে এলাকার বিস্তীর্ণ জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে কৃষকরা বাড়তি আয় করতে পারছেন। এছাড়া বাড়ির পাশের নিচু জমিতে নারীরাও ধাপ তৈরি করে নানা রকম সবজি চাষ করে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতায় অবদান রাখছেন।

এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধ জমিতে ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। একসময় কৃককরা বর্ষা মৌসুমের দীর্ঘ ছয়-সাত মাস কর্মহীন থাকতেন। কিন্তু এখন নিজেদের জমিতে সারা বছর বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করতে পারছেন। এতে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি আবাদি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারও নিশ্চিত হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল সন্নিহিত জলাবদ্ধ এলাকায় এ চাষ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। গাওতা পদ্ধতির চাষ এসব এলাকার জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

হোগলা চাষ

জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহনীয় হোগলা চাষ নব দিগন্তের সূচনা করেছে নোয়াখালীর কৃষিতে। পতিত জমিতে বীজ ছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে ওঠা হোগলা স্থানীয় অর্থনীতি ও জীবিকায়নে বড় ধরণের ভূমিকা রাখছে। হোগলা গাছের খুব বেশি পরিচর্যা লাগে না, কোনো প্রকার সার ও কীটনাশকেরও দরকার হয় না এবং শ্রম ও ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়ায় দিন দিন এ অঞ্চলে হোগলার আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। সেই সাথে বাড়ছে হোগলা পাতার তৈরি নানা রকম পণ্য সামগ্রীর চাহিদা। ফলে হোগলাকেন্দ্রিক জীবিকায়নের নতুন নতুন ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে।

জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, সেচের পানির সুযোগ না থাকা এবং বছরের ছয় মাস জলাবদ্ধতার কারণে কৃষিকাজে কোনভাবেই কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না নোয়াখালী সদর উপজেলার কালাদরাপ ইউনিয়নের রামহরিতালু গ্রামের কৃষকরা। এক সময় তারা নদীর পাশে পড়ে থাকা হোগলা দিয়ে কোনো কিছু করা যায় কিনা তা চিন্তা করেন এবং হোগলা দিয়ে চাটাই, দড়ি, বিছানা তৈরি করেন। শুরুর দিকে গ্রামের নারীরা হোগলা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানাতো এবং পুরুষরা তা বাজারে নিয়ে বিক্রি করতো। এটি তাদের বাড়তি রোজগার হিসেবে দেখতো; কিন্তু ক্রমশ কৃষি কমে যাওয়ার কারণে তারা একসময় হোগলা দিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নোয়াখালী সদরের কালাদরাপ ইউনিয়নের রামহরিতালু গ্রামের নুরুজ্জামানের ছেলে আবুল বাশার। পরিবারের বাড়তি উপার্জনের আশায় ১৩/১৪ বছর বয়সেই নেমে পড়েন হোগলা পাতার ব্যবসায়। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহস্থদের কাছ থেকে হোগলা পাতা কিনে স্থানীয় খলিফার হাট ও রব বাজারে সেগুলো বিক্রি করতেন। গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে হোগলার তৈরি চাটাই, দড়ি, ঝুড়ির ব্যবসা করছেন তিনি। গ্রামের নারীদের তৈরি হোগলা পাতার

এসব কারুপণ্য সরবরাহ করেন ঢাকাসহ দেশে বিভিন্ন হস্তশিল্প উদ্যোক্তাদের কাছে। ২০০৪ সালে হোগলা পাতা দিয়ে দড়ি বানানোর কাজে হাত দেন আবুল বাশার। তিনি নিজে এবং পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করে হোগলা পাতার দড়ি বানাতেন। পরবর্তীতে গ্রামের নারীদেরকে হোগলা দড়ি বানাতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং নিজেই দড়ি বাজারজাতকরণ শুরু করেন। বর্তমানে সদর উপজেলার পশ্চিমাঞ্চলের কালাদরাপ, চরমটুয়া, পূর্বচরমটুয়া ও এওজবালিয়া ইউনিয়নের ২২টি গ্রামের প্রায় ১২ হাজার মহিলা হোগলা দড়ি তৈরি করেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিংবা হাট থেকে দড়ি কিনে এখন ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করছেন। গত বছর তিনি ছয় কোটি হাত দড়ি বিক্রি করেছেন। প্রতিমাসে তিনি ছয় থেকে সাত লাখ টাকা হোগলার তৈরি সামগ্রী বিক্রি করছেন।

হোগলা এক ধরণের জলজ উদ্ভিদ। একটা সময় ছিল যখন সাগর ও নদীর পাশে প্রাকৃতিক নিয়মে হোগলা জন্মাতো। চর জাগার পর ওইসব জায়গায় হোগলার মূল রয়ে যায়। যা পরবর্তীতে আশপাশের জমিগুলোতে সম্প্রসারিত হতে থাকে। নোয়াখালী সদর উপজেলার পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপকহারে হোগলার চাষ হচ্ছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হওয়ায় কৃষক হোগলা গাছের যত্ন করতে শুরু করে। পাশাপাশি নতুন নতুন জমিতে হোগলা চাষ সম্প্রসারণ হচ্ছে।

ক্ষেত থেকে হোগলা পাতা সংগ্রহের সময়টা বর্ষার শেষে এবং শীতের শুরুতে অর্থাৎ বাংলা কার্তিক-অগ্রাহায়ণ মাস। রবি ও খরা মৌসুমে হোগলা জমিতে সাথী ফসল হিসেবে বিভিন্ন সবজি, ডাল জাতীয় শস্য, মরিচ ইত্যাদি চাষ করা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে হোগলা জমি থেকে কিছু পাতা পাওয়া যায়। একবার কোনো জমিতে এই পাতা জন্মানোর পর আর চাষ করতে হয় না, পূর্ববর্তী বছরের পাতার গোড়া থেকে আবার নতুন পাতা বেরিয়ে আসে। পাতা কাটার পর সাধারণত জমিতে ১০/১২ দিন ছড়িয়ে রাখা হয়। দুদিন পর পর পাতার রং ঠিক রাখার জন্য প্রতি দু'দিন পর পর তা উল্টিয়ে দিতে হয়। এতে করে পাতা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। শুকনো পাতা আঁটি বেঁধে ঘরের মধ্যে মাচা করে রাখা হয়।

নোয়াখালী সদর উপজেলার ২২ গ্রামের অন্তত ১২ হাজার নারী শুধুমাত্র হোগলার দড়িই নয়, প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমানে দৃষ্টিনন্দন নানা গৃহস্থালী সামগ্রী তৈরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন।

খাঁচায় মাছ চাষ

জমিতে ফসল ফলানোর চেয়ে নদীতে মাছ চাষকে লাভজনক মনে করছেন বরিশালের মুলাদি উপজেলার কাজীর চর ইউনিয়নের কৃষকরা। ইউনিয়নের আট হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল কৃষি কাজ। কিন্তু নদী ভাঙনের ফলে জমি-জিরেত হারিয়ে, কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত ফসলের লাভজনক দাম না পেয়ে এক সময় মানুষগুলো জীবিকা নির্বাহের বিকল্প রাস্তা খুঁজতে নামেন।

আঁড়িয়াল খা নদীর তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দা বাবুল খা। আঁড়িয়াল খা নদী কেড়ে নেয় তার চারপাশ। তিনবার বাড়িঘর স্থানান্তর করতে হয় তাকে। জীবিকার সন্ধানে একসময় বিদেশে পাড়ি জমান এবং ফিরে এসে ছোট একটা ব্যবসা শুরু করেন, কিন্তু ব্যবসাও আলোর মুখ দেখেনা। এই সময় পরিচয় হয় এক মৎস্য চাষীর সাথে-তিনি খালের মধ্যে জালে বা খাচায় মাছ চাষ করেন। শুনেছি বেশ লাভজনক ব্যবসা' এ চিন্তা থেকে একদিন বাবুল খা খাচায় মাছ চাষ দেখতে যান এবং ধীরে ধীরে পদ্ধতি শিখে নেন।

দুই হাজার আট সালে ব্যবসা ছেড়ে বাবুল আবার ফিরে এলাম আঁড়িয়াল খা'র তীরে- মুলাদী গ্রামের বাড়িতে। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনে শুরু করলেন মাছ চাষের জন্য খাঁচা তৈরির কাজ। শুরু হলো 'কেস কালচারে মাছ চাষ' বা ভাসমান পদ্ধতিতে খাঁচায় মাছ চাষ। একটি খাঁচার দৈর্ঘ্য ২০ ফুট আর প্রস্থ ১০ ফুট, গভীরতা ৬ ফুট। যেখানে খাঁচাটি বসবে সেখানে ছয় থেকে সাত ফুট পানির গভীরতা থাকতে হয়। খাঁচা তৈরিতে মশারি জাল, ড্রাম, বাঁশ, প্লাস্টিকের দড়ি, ইট ও নোঙ্গর বা টানা ইত্যাদি উপকরণ লাগে। একটি খাঁচায় এক হাজার মাছ চাষ করা সম্ভব। খাঁচা তৈরি করার সময় এলাকার মানুষরা এ পদ্ধতিতে মাছ চাষকে তেমন একটা আমলে

নেননি। প্রথমে তিনটি খাঁচা তৈরি করে সেখানে তিন হাজার রেনু পোনা ছাড়েন। খরচ মেটানোর জন্য চার/ পাঁচ মাস পর একটু বড় হওয়া মাছ বিক্রি করার পর দেখা যায় ভালই লাভ হচ্ছে। পোনা কিনে মাছ চাষ করতে গেলে খরচ বেশি পড়ে বলে নিজেই ৩৩ শতাংশ জমিতে চতুর্দিকে বাঁধ দিয়ে ঘের বানিয়ে রেনু পোনা উৎপাদনও শুরু করলেন। শুরু হলো বাবুল খা'র অন্য জীবন। এই উদ্যোগটি গ্রহণের আগে তার প্রতিদিনকার অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। বর্তমানে তিনি খাঁচায় মাছ চাষ করে আগের চেয়ে ভাল আছেন। সব খরচ বাদ দিয়ে প্রতি মাসে এখন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা মুনাফা থাকছে। এ পদ্ধতিতে রেনু থেকে একটি মাছ এক কেজি ওজন হতে সময় নেয় আট মাস। খাবার লাগে দুই কেজি। এক কেজি মাছের দাম ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা। কিন্তু বিনিয়োগ করতে হয় কেজিপ্রতি ৯০ টাকা। এতে করে কেজি লাভ হয় গড়ে ৭০ থেকে ৮০ টাকা।

বর্তমানে এলাকার প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং চাষ করছেন। কাজীর চরের শাখা নদীর পাঁচ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ৫৬০টি খাঁচায় মাছ হচ্ছে। বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে সর্বমোট ৫৮০টি কেস কালচার পদ্ধতির সিংহভাগই মুলাদী কাজীরচরে। মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহের এ পদ্ধতিতে অনেক মানুষ যুক্ত হওয়ার ফলে এলাকার চিত্র এখন অনেকটা বদলে গেছে। যারা কৃষিতে সুবিধা করতে পারেনি তারা ধীরে ধীরে পেশা পরিবর্তন করে মৎস্য চাষকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করছেন।

বাবুল খা'ই প্রথম এই এলাকায় মাছ চাষ শুরু করেন। তাই যে কেউ এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে আগ্রহী হলে তিনিই তাদের ভরসা এবং তিনি তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। এলাকার অধিকাংশ চাষীই কেস কালচার ও ঘেরে মাছের খাবার সংগ্রহ করেন বাবুল খা'র কাছ থেকে। মধ্যউপকূলের এই অঞ্চলে কখনো খরা কখনো লবণাক্ততা, কখনো বা বন্যার পানিতে জমিজমা তলিয়ে যায়- পুড়ে যায়। সেই সাথে বাজারে গিয়ে দাম না পাওয়ার বিপদ তো আছেই; এসব বিবেচনায় অনেক কৃষক ধান উৎপাদন থেকে বেরিয়ে এসে বিকল্প পেশা হিসেবে মৎস্য চাষকে বেছে নিচ্ছে। এই পেশাটি লাভজনক হওয়ায় স্থানীয় তরুণরাও এতে যুক্ত হচ্ছেন।

আল চাষ

চট্টগ্রামের চকরিয়া উপজেলার মেধাকচ্ছপিয়া ইউনিয়নের হারাধন মাঝি। এক সময় নিজের যৎসামান্য জমিতে চাষাবাদ করেই চালাতেন সাত সদস্যের পরিবার। আশির দশকে চকরিয়া সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে চিংড়ি চাষ শুরু হলে তা স্থানীয় কৃষক- জেলেসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনে এক চরম অভিশাপ হিসেবে আবির্ভূত হয়। চিংড়ি চাষের ফলে একদিকে ধ্বংস হয় চকরিয়া সুন্দরবনের বিশাল ম্যানগ্রোভ বন; আর অন্যদিকে লবণ পানির আগ্রাসনে দিনে দিনে ধ্বংস হতে থাকে কৃষিজমির উর্বরতা। সেই সাথে পাহাড়ী ঢল প্রতি বছর চকরিয়া সুন্দরবনের আশপাশের মানুষের জীবনে আরেক অশনি হিসেবে দেখা দেয়। বন ধ্বংস করে চিংড়ি চাষের ফলে বেড়ে যায় মাটির ক্ষয় আর পাহাড়ী ঢলের সাথে ক্ষয়ীভূত মাটি মাতামুহুরী নদীতে পতিত হয়ে ভরাট করে ফেলে নদীর তলদেশ। কমে যায় নদীর স্বাভাবিক পানি ধারণ ক্ষমতা।

একদিকে চিংড়ি ঘেরের কারণে সারা বছর জমিতে পানি আটকে রাখা অন্যদিকে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে নদীতে অধিক পানি ধারণ করতে না পারায় নব্বইয়ের দশক থেকে চকরিয়া সুন্দরবন সংলগ্ন মাতামুহুরী নদীর চারপাশের এলাকায় বন্যার প্রকোপ বেড়ে যায়। ফি বছর পাহাড়ী ঢলের পানিতে তলিয়ে যায় স্থানীয় মানুষের ঘর-বাড়ি-জমি। সৃষ্টি হয় দীর্ঘমেয়াদী বন্যা।

১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচ বছরের বেশিরভাগ সময় বন্যার পানিতে তলিয়ে থাকে মেধাকচ্ছপিয়া, রামপুরা, বদরখালী, চরণদ্বীপ, বাটাখালী, ভেউলা মানিকচর, কোনাখালী, কাঁকাড়া প্রভৃতি এলাকা। এই দীর্ঘ সময়ে কোথাও আংশিক আবার কোথায়ও

পুরোপুরি পানির নিচে তলিয়ে ডুবে থাকায় সুন্দরবন এলাকার মানুষ শাক-সবজির উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়। সেই সময়ে হারাধন মাঝি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড এলাকায় জমির আলে শিমের চাষ দেখতে পান। এটি তার মনে আশার সঞ্চার করে। তিনি ফিরে গিয়ে তাঁর বাড়ির পাশ্ববর্তী জমির আলে সর্বপ্রথম শিমের চাষ করার উদ্যোগ নেন। বর্তমানে এ উদ্যোগটি যেমনি পরিচিতি পেয়েছে তেমনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মেধাকচ্ছপিয়াসহ চকরিয়া সুন্দরবনের চিংড়ি ঘের এলাকায়।

এ পদ্ধতিতে চাষের সুবিধা হচ্ছে সবজির বীজ, বাঁশের খুঁটি প্রভৃতি উপকরণ সহজেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায়। আল চাষ শুরু করার আগে হারাধন মাঝি সুন্দরবন থেকে কাঠ কেটে, কখনো মাছ ধরে কোনো মতে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু আল চাষের মাধ্যমে বারো মাস শিম, বরবটি, ঢেঁড়শ, পেপে, চিচিঙ্গা, কুমড়া প্রভৃতি উৎপাদন করে এখন তিনি স্বচ্ছলতা ফিরে পেয়েছেন। এখন তার মাসিক আয় আট থেকে দশ হাজার টাকা। মেধাকচ্ছপিয়া ইউনিয়নের প্রায় সব পরিবার এখন আল চাষের সাথে যুক্ত। জমি কিংবা ঘেরের মালিকরাও সরাসরি নিজেরা চাষ করছেন। আবার অনেক ঘেরশ্রমিক ঘের লিজ নিয়েও আল চাষ করছেন।

এ উদ্যোগটি বন্যা ও জলাবদ্ধতার সাথে অভিযোজনে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। জলাবদ্ধতা, আকস্মিক বন্যা ও চিংড়ি চাষের কারণে এলাকায় ধান ও সবজি চাষ প্রায়শই ব্যাহত হতো। এখন এ পদ্ধতিতে সবজি চাষের ফলে কোনো জমি আর অনাবাদী নেই। সব জমিতেই এ পদ্ধতিতে সবজি চাষ হচ্ছে। একদিকে জমিতে চিংড়ি চাষ, অন্যদিকে জমির আলে সবজি চাষে জমির শতভাগ ব্যবহার সম্ভব করেছে। একসময় যেসব জমিতে চিংড়ি চাষ করা হতো না কিন্তু পানি জমে থাকতো, এখন সে জমিতেও মাচা ব্যবহার করে সবজি চাষ করা হচ্ছে। কোনো জমি পতিত থাকছে না। বছরের প্রায় বারো মাস এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এখানে সবজি চাষ হচ্ছে।

দেশী মুরগি চাষ

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় প্রায় প্রতিটি পরিবারই মুরগি পালন করে, এই মুরগিগুলো 'দেশী মুরগি' জাত বলে পরিচিত। মুরগি পালনের ফলে তা যেমন পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটায়, অন্যদিকে এটি পরিবারের একটি আয়ের উৎসও বটে। পরিবারের নারী সদস্যরা তাদের প্রতিদিনকার গৃহকাজের অংশ হিসেবে মুরগি পালনের কাজটি করে থাকেন। এজন্য আলাদা কোন খামার বা বিশেষ কোন ব্যবস্থারও প্রয়োজন হয় না। সারাদিন বাড়ির আশপাশের খরকুটো উচ্ছিষ্ট, পোকামাকড় খেয়েই দেশীয় জাতের মুরগিরা জীবন ধারণ করে। বলা যায়- এটাও একধরনের প্রতিবেশ ব্যবস্থা; কিন্তু দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এই পতিবেশ ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে পড়েছে। অন্যদিকে খামারের (ব্রয়লার) মুরগি চাষে বেশি খরচ এবং বিভিন্ন ধরণের বাড়তে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় বলে এই অঞ্চলে মুরগি চাষ তুলনামূলকভাবে কমে গেছে।

দেশীয় জাতের মুরগি পালনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এখনও সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সচেতনতার অভাবে রোগব্যাধির প্রকোপ, কম পরিমাণে ডিম ও বাচ্ছা উৎপাদন, স্বল্প দৈহিক বৃদ্ধি, বন্য প্রাণীর আক্রমণ ইত্যাদি সমস্যার জন্য এই ধরণের পালন ব্যবস্থায় কৃষকরা প্রত্যাশিত পরিমাণে মুরগি উৎপাদন করতে পারেন না। অথচ দেশি মুরগি পালন ব্যবস্থায় কিছুটা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটালে স্থানীয় জাতের মুরগির উৎপাদন অনেক বেশি বাড়ানো সম্ভব।

দেশীয় মুরগি আমাদের দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এদের তেমন একটা রোধব্যাধী হয় না। এ জাতের মুরগি তাদের খাবারের বেশিরভাগই নিজেরা আশপাশ থেকে সংগ্রহ করে

বলে পালনের খরচও কম। দক্ষিণাঞ্চলে পরিকল্পিত উপায়ে দেশীয় জাতের মুরগি পালনে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে একটি পদ্ধতিকে 'আধা ছাড়া – আধা আবদ্ধ' (সেমি-এক্সক্যাভেনিজং) পালন পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত: মুরগিকে কিছুটা সময় খাঁচায় আটকে রাখা হয় এবং বাকি সময় ছেড়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও ক্ষেত্রে বিশেষে ক্রিপ ফিডিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে মুরগির বাচ্ছা মা থেকে আলাদা করে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয়।

স্থানীয় ভাবে দেখা গেছে দেশি মুরগি নিয়মমাফিক চাষ করা উন্নত জাতের মুরগি চাষের থেকে লাভজনক। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেশি মুরগির একটি উৎপাদন চক্র ১৩৫ দিনের পরিবর্তে মাত্র ৫০ থেকে ৬০ দিনে নামিয়ে আনতে হবে। ফলে বছরে তিনটি চক্রের পরিবর্তে ছয়টি চক্র সম্পন্ন করা যায়। এতে মা-মুরগির ডিম উৎপাদন বছরে ৯০ থেকে ১২০টি পর্যন্ত বাড়ে। সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদন চক্রের প্রধান তিনটি ধাপে (যেমন ডিম পাড়া, বাচ্ছা ফোটানো ও বাচ্ছা লালন-পালন) মা–মুরগির গড়ে ১৫০ দিন সময় লাগে। পরিকল্পিত উপায়ে পারনের ক্ষেত্রে প্রথম দু'টি ধাপ –ডিম পাড়া ও বাচ্ছা ফোটানোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। আর আবদ্ধ করে সুষম খাবার দিয়ে ও বিশেষ যত্ন নিয়ে বাচ্ছা লালন-পালন করা হয়। একেই ক্রিপ ফিডিং পদ্ধতি বলা হয়।

উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন গ্রামে নারীরা দেশীয় মুরগী চাষের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠছে। এই মুরগি চাষে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নিতে হয় না এবং বাড়তি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না বলে তারা এদিকে ঝুঁকছেন। নারীদের এই উদ্যোগ একদিকে বিপদাপন্ন সময়ে সংসারে যেমন আর্থিক শক্তি যোগায় পাশাপাশি নিয়মিতভাবে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পুরণ করে।

নোনা সহনশীল মাছ চাষ

এক সময়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য- উপকূলীয় এলাকা মাছের ভান্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল। এখানে ছিল কৈ, মাগুর, শিঙি, শোল, টাকি (ল্যাটা), রয়না (ভেদা), বেলে, নুন্দি-বেলে প্রভৃতি জাতের মাছ; যেগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। সুন্দরবনের নালা-খালেও মাছের ধরণ ও সংখ্যায় কমেছে। পরিসংখ্যান মতে, আমাদের দেশে সাতশোর বেশি প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। এরমধ্যে প্রায় তিনশো প্রজাতির ছোট মাছ। উপকূলীয় অঞ্চলের সামান্য নোনা ও মিষ্টি পানির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা পরিবেশের কারণে এখানে মাছের অপার বৈচিত্র্য ছিল। বর্তমানে এই অঞ্চলের পানি ও মাটি উভয় ক্ষেত্রে নোনার ভয়াবহ দাপট। পোল্ডার ব্যবস্থা, অপরিকল্পিত ব্রিজ-পুল-কালভার্ট-রাস্তা-স্লুইস নির্মাণের ফলে মাছের অবাধ যাতায়াত বাধাগ্রস্ত করছে এবং মাছের প্রজনন ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। চিংড়ি চাষের জন্য খাল ও নদী বন্ধ করে দেওয়া এবং জলাবদ্ধতার কারণেও মাছের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। জীবন-জীবিকার সংকটে পড়েছে মৎস্যজীবী মানুষ। এই অবস্থায় অনেকে পুকুর বা জমিতে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ বাঁধ দিয়ে সীমানা তৈরি নোনা সহনশীল নানা জাতের মাছের চাষ করছে। প্রতিকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে মানুষ খুঁজে নিচ্ছে বিকল্প জীবিকায়নের রাস্তা।

ভেটকি মাছ চাষ

সাগরের মাছ বলে ভেটকি মাছের পরিচিতি রয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের নদী-নালা-খালে প্রচুর পরিমাণে এই মাছ পাওয়া যায়। এই মাছের বাজারমূল্য বেশি এবং ব্যাপক চাহিদা থাকায় মানুষ বর্তমানে ভেটকি মাছ চাষ শুরু করেছে। তবে কৃত্রিম উপায়ে এই মাছের পোনা জন্ম দেওয়া যায় না বলে ব্যাপকভাবে ভেটকি মাছের চাষ সম্প্রসারণ হয়নি। সাধারণত সমুদ্রের পানি কূলের কাছাকাছি ভূমিতে নোনা পানি টেনে আনলে তার সাথে ভেটকি মাছের

পোনা আসে এবং মানুষ সেখান থেকে পোনা সংগ্রহ করে মাছের চাষ করে। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর, আশাশুনি, কালিগঞ্জ, দেবহাটা এবং খুলনা জেলোর কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ প্রভ"তি উপজেলায় নোনা পানির প্রাকৃতিক উৎসের সহজলভ্যতার কারণে ভেটকি মাছ চাষের বিকাশ ঘটেছে।

নোনা পানির টেংরা চাষ

নোনা টেংরা একটি আইশবিহীন শুঙ্গযুক্ত মাছ। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এই মাছটি সর্বোচ্চ ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ২৫০ গ্রাম পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে। ৫ থেকে ১২ পিপিটি লবণাক্ততা এ জাতের টেংরা মাছেরও বসবাসের জন্য উপযুক্ত; তবে এরা এই মাত্রার চেয়ে অধিক বা কম লবণাক্ততায়ও টিকে থাকতে পারে। প্রজনন মওসুমে ৫০ থেকে ২০০ গ্রাম ওজনের নোনা টেংরারা ডিমের সংখ্যা ৩০ হাজার থেকে দেড় লাখ পর্যন্ত হয়ে থাকে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলভাগে সহজপ্রাপ্যতা এবং কৃত্রিম উপায়ে নোনা টেংরার পোনা উৎপাদন করা সম্ভব বিধায় উপকূলীয় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের কাছে টেংরা চাষ অধিকহারে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

শিং মাছ চাষ

অতীতে উপকূলীয় বিল অঞ্চলে ব্যাপক হারে শিং মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু নোনার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এবং বিলগুলো জলাবদ্ধ হয়ে পড়ায় শিং মাছ ধীরে ধীরে কমে আসছে। তবে সামান্য নোনায় এই মাছ টিকে থাকতে পারে। এই কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক জায়গায় নোনাপানির সাথে মিঠা পানির মিশ্রণ ঘটিয়ে পুকুরে, খাল-নালা বা ডোবায় পরিকল্পিতভাবে শিং মাছ চাষ করছে। এছাড়া কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এই মাছের পোনা উৎপাদন শুরু করা যায় এবং বাজারে শিং মাছের ভালো মূল্য পাওয়া যায় বলে অনেক কৃষকই এখন শিং মাছ চাষ করছে।

পাঙ্গাস চাষ

বর্তমানে পাঙ্গাস চাষ বেশ জনপ্রিয়। নোনা অধ্যুষিত উপকূলীয় অঞ্চলেও এই মাছের চাষ হয়। কম অক্সিজেন, লবণাক্ততা, পানির ঘোলাত্বের তারতম্য প্রভৃতি অবস্থায়ও পাঙ্গাশ মাছ বাঁচতে পারে এবং রাক্ষুসে মাছ নয় বলে রুই জাতীয় মাছের সাথেও পাঙ্গাশের মিশ্র চাষ করা যায়। বর্তমানে চাষীরা স্বল্প থেকে মধ্যম লবণাক্ত পানি (২ থেকে ১২ পিপিটি), ঘের ও খাঁচা এবং অন্যান্য মৌসুমী জলাশয়ে পাঙ্গাসের চাষ করছে।

মাঁচাঘরে মুরগি পালন

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ উপজেলা। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বেগমগঞ্জের বেশিরভাগ এলাকা বছরের সাত-আট মাস সময় জলাবদ্ধ থাকে। ফলে এ অঞ্চলের মানুষেরা কৃষি জমিতে ধান বা অন্য কোন শস্য এক মওসুমের বেশি চাষ করতে পারে না। বেগমগঞ্জের একলাশপুর ইউনিয়নের জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের মোহাম্মদ মহসীন। আগে কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করলেও, বছরজুড়ে জলাবদ্ধতা আর চাষের জমি কমতে থাকায় এখন আর পর্যাপ্ত পরিসরে চাষাবাদও করতেপারেন না। সংসারে দেখা দেয় অভাব-অনটন। বাড়তি রোজগারের আশায় একটা সময় মালয়েশিয়া গিয়ে সেখান থেকেও ফিরে আসেন।

বছর ছয়েক আগে শুরু করেন জলাবদ্ধ জমিতে মাঁচাঘর করে মুরগির পালন। নিজের জমির উপরে তৈরি করে মাঁচাঘর। বিকল্প এই উদ্যোগে দুই লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে প্রথমে এক হাজার মুরগির বাচ্চা দিয়ে মুরগির খামার শুরু করেন। এক ব্যাচ বাচ্চা মুরগি বিক্রির উপযোগী হতে সময় লাগে ৪৫ দিন। বছরে সাত- আট ব্যাচ সম্পন্ন করা যায়। দেড়-দুই লাখ ব্যয়ে বছরে প্রতি ব্যাচ মুরগি বিক্রিতে ১৫-২০ হাজার টাকা লাভ হয়। এই বছর লাভের অংশ থেকে মহসিন একটি গরু কিনেছেন, আগের বছরও কিনেছিলেন একটি গরু। তবে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকূলতার কারণে লোকসান হলেও গড়ে বছরে লাভের পাল্লাই ভারী থাকে।

বছর জুড়ে দীর্ঘ জলাবদ্ধতার কারণে মহসীন এ উদ্যোগ হাতে নেন। নোয়াখালী জেলার বেশির ভাগ উপজেলার ফসলী জমিই বছর জুড়ে অনাবাদি থাকে। সরকারি হিসেবে জলাবদ্ধতার কারণে গেল বছরে নোয়াখালীতে প্রায় ৬৫ হাজার হেক্টর জমি অনাবাদী ছিল। উপরে মাঁচাঘর করে মুরগি পালন, নিচে মাছ চাষ, শুকনো মৌসুমে ধান চাষ- পদ্ধতিতে চাষাবাদ দেখে আশপাশের অনেকেই এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

বাড়ি ১১, সড়ক ৩৩/এ, হাউজিং এস্টেট, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।

ফোন : +৮৮০ ৩২১ ৬১৯২০, ইমেইল : info@pran.org.bd

ওয়েবসাইট : www.pran.org.bd